বিচরণরেখা

অচিন্ত্য বিশ্বাস

লিইবার ফিয়েরা

প্রথম পর্ব

১

ঠক করে শব্দ হল। কলাপাতার পাশে মাটির দুটি পাত্র। মাধবী বলল—নে সই ওঠ, একটু খেয়ে নে। এই শরীরে তোকে আর চূর্ণায় স্নানে যেতে হবে না।

—না রে, তোর কথা আমি শুনব না— তুই জানিস।

—তা বটে। গায়ে জ্বর নিয়ে তিন বেলা স্নান করতে না পারলে 'কাইপাল্লিইল্লমে' নাম্বুদ্রি গিন্নি থাকা যায় না! বিদ্যাধিরাজার অপমান হয়।

—হ্যাঁ রে, হ্যাঁ— আর্যাম্মার মুখে মৃদু হাসি। সেই হাসি মাধবী চেনে। জানে এর আড়ালে কাজ করছে এক তীব্র অভিমান। প্রতিবেশী মাধবী আর্যাম্মার সমবয়সী— একটু ছোটই হবে। ওর সঙ্গে সই পাতানোর কারণ ছিল। দুজনই একরকম। ব্যথার আঁচলে মোড়া বিষণ্ণ দিনরাতের আকর্ষণ তাদের।

তখন পালঘাট থেকে ত্রিচুর, চিদাম্বরম থেকে গুরুভাইয়ুর শান্তির সবুজ দিকরেখায় হঠাৎ হঠাৎ আসছে বিচিত্র জাহাজ। তেমনি একটি জাহাজে মাধবীর তেরো বছরের ছেলেটি ভাসতে ভাসতে চলে গেছে। যাবার সময় বলে গেছে, আমি চলে যাচ্ছি মা। কিন্তু বোঝা হয়নি, কিসের অভিমান ছিল তার ছোট ছেলে পুটাপ্পার। যাবার সময় শুকনো কলাপাতায় মুড়ে রেখে গেল তার পৈতে— বলল আমি সদাপ্রভুর ডাক শুনেছি।

আর্যাম্মা এসে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, আমাকে চেয়ে দেখ! মাধবী কী বুঝবে— কী দেখবে? দেখার কী আছে? আর্যাম্মার একমাত্র ছেলে চলে গেছে মাসখানেক হল। কি—না সন্ন্যাসী হবে।

মাধবী আর্যাম্মাকে দেখে আরও তীব্র ভাবে কাঁদতে লাগলেন। দূরে আরব সাগরের লোনা ঢেউ মেশানো বাতাস আছড়ে পড়ল কলাগাছ দুলিয়ে।

নারকেল গাছের পাতা সিরসির করতে লাগল। সেদিন শীতের সকাল। তবে মালাবারে গরম আর অল্প গরম, বর্ষা আর বেশি বর্ষা ছাড়া তেমন কোনো কাল নেই। আর্যাম্মাকে দেখে কান্না তীব্র থেকে স্তব্ধতায় পরিণত হল।

—তোমার মন না পাষাণ বলো তো!

মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে আর্যাম্মা বললেন, থাম তো বোন। আমার শঙ্কর বড়ো কাজে গেছে।

—ছাই। ছেলেরা সবাই শত্রু। মায়ের ব্যথা বোঝে না। মায়া-মমতা নেই। নিষ্ঠুর ওরা।

—আচ্ছা হল। এবার ওঠো— স্নানের সময় হল।

চূর্ণা নদীর তীর ঘেঁষা মদনমোহন মন্দির ভেঙেচুরে গেছে। ওখানে পূজারতি না দিয়ে মুখে খাবার দেয় না দুজনই। উঠল তারা। পুট্টাপ্পা অনেকদিন থেকেই উপকূলে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকত। তার মনে কী হত, কেউ জানে না। এক-আধদিন মাকে বলত, আমি থাকব না।

—কোথায় যাবি? এই তো বছরও গড়ায়নি, পৈতে হয়েছে। আর কদিন পার হলেই তোর কষ্ট কমে যাবে।

স্বপাক করে দেবার্চনা করে দিনপাতের যান্ত্রিকতা তার বোধহয় ভালো লাগছিল না। সে লক্ষ করেছিল ইশামসি-র ছোট্ট গির্জাঘর। লক্ষ করেছিল ওদের মধ্যে কড়াক্কড়ি নেই। যাজকরাও পরিবারে থাকে, মদ্যপানে আমিষ আহারে, কোনো বিধিনিষেধ নেই। হয়তো সেই ছিল তার যাত্রার মূল টান।

মদনমোহনকে সাক্ষী রেখে দুজন তুলসী দল হাতে নিয়ে সই পাতাল। দুই বিধবা; পরিবারে একা মহিলা। পাশাপাশি নাম্বুদ্রি পরিবারগুলির সবাই সবাইকার পাশে দাঁড়ায়, সাহায্য করে। ত্রিবাঙ্কুরের রাজার সিধা আসে অবরে সবরে। চতুষ্পাঠী চলে— যজ্ঞাগ্নি থেকে উড়ে আসে ঘিয়ের গন্ধ মাখা ধোঁয়া; আরব সাগরে ঢেউ ওঠে। কিন্তু মাধবী মনে মনে সবকিছুর বিরুদ্ধে ক্ষোভ জাগিয়ে রাখে। তার ধারণা, এত নিয়ম-কানুন বিধি-নিষেধ— ধর্মের নামে এত আত্মপীড়ন আর সংযম ব্রহ্মচর্যের বাড়াবাড়ি, এখানেই রয়েছে তার একমাত্র পুত্রের বিধর্মী হবার আসল কারণ।

মাধবীর কথা স্বীকার করে না আর্যাম্মা। তাই যদি হবে তাঁর অতুলনীয় অভিজ্ঞতা মিথ্যা হয়ে যাবে। কথাগুলো বিশেষ করে মনে পড়ে যখন শরীর ভেঙে পড়েছে। শঙ্কর চলে যাবার পর থেকে এমন ছিল না। রোজ

মনে হত হাঁসের মতো ডানা মেলে ওই যে চলে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে জাহাজ— পাল তোলা জাহাজগুলি; ওরা তো শুধু যায় না— আসেও। কালীকূট নামে একটা জায়গা আছে— দু-দিনের পথ, উত্তরে। শঙ্করের বাবা শিবগুরু বলেছিলেন। সেখানে জাহাজ আসে। বিরাট বন্দর হয়েছে সেখানে।

কত দেশ-বিদেশের মানুষ আসে-যায়— সে এক বিরাট শহর— তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না। এক যজমানের বাড়িতে দেব-প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছিলেন শিবগুরু। অনেক সোনা-দানা এনেছিলেন। সঙ্গে ছিল একটি অদ্ভুত কষ্টিপাথরের মূর্তি।

—এই দেবতা আগে তো দেখিনি! কে ইনি?

—পরম সৌগত পরম ভট্টারক বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর

খিল খিল করে হেসেছিলেন আর্যাম্মা। এমন উদ্ভট দেবতার নাম তিনি জীবনে শোনেননি। পিতা মঘাপণ্ডিতের কাছে বহু দেবতার নাম শুনেছেন— অষ্টোত্তর শত নাম। কিন্তু এই আশ্চর্য দেবতার নাম তিনি শোনেননি। শিবগুরু বললেন, মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন দুয়েকজন পূর্বদেশীয় গৌড়ীয়-মাগধী বণিক। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন চীবরধারী মুণ্ডিত মস্তক একজন। তাঁর যজমানকে বলেছিলেন, ধ্যানী শিবের পূজা করে কিছু হবে না।

সরল মনে ভাঙা ভাঙা প্রাকৃতে সম্বুগম প্রশ্ন করেছিল—কেন? কেন আমি শিবোপাসনা ছাড়ব?

বঙ্গদেশী বৌদ্ধ গড় গড় করে বলে গেলেন, জন্ম-বৃদ্ধি-জন্মদান-পীড়া-যাতনা আর মৃত্যু ছাড়া কিছু থাকে না। সব শূন্য।

শিবগুরু বললেন, এসব তো অজিত কেশকম্বলীর মতো। আপনি কি অর্হৎ?

—না।

—তবে?

—আমরা সৌগত। জগদ্‌ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বুদ্ধদেবের মহাযানে আমরা সঞ্চার করি।

শিবগুরু কথা বাড়াননি। সম্বুগম দ্রব্যাদি প্রস্তুত করেছিল। সব উপকরণ একত্র করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন শিবগুরু। পূজা সমাপন করে ঘণ্টাধ্বনির শব্দ ছাপিয়ে গেল দূরের জাহাজঘাটার আওয়াজ। 'জাহাজ ছেড়ে যাচ্ছে।' অনুরাধাপুরের যাত্রী, তুষ্টিকৃতম্, রাজা মাহেন্দ্র, জগরনাথ আর

দামলুক হয়ে সোমপুর—। বণিকরা চলে গেলেন। ভিক্ষু রেখে গেলেন এই দণ্ডায়মান মূর্তি— অনেকটা যেন বিষ্ণু। অন্য মতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ পিতা বিদ্যাধিরাজা বা শ্বশুর মশাই মঘাপণ্ডিতের কাছে শেখেননি শিবগুরু। মণ্ডপমের পাশে মুরুগণ যেখানে প্রহরারত, সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন 'পরম সৌগত পরম ভট্টারক'।

মাধবী অবশ্য এসবে মেয়েদের কিছুমাত্র মুক্তি খুঁজে পেত না। তার ভাবনা ছিল এসব পুতুলখেলা পুরুষের— একান্ত তাদের খেয়াল ও স্বপ্ন— মেয়েরা শুধু দুঃখ সহ্য করার জন্য।

আর্যাম্মা বলতেন— মায়া।

মাধবী —মোটেই না। গর্ভধারণ, জন্ম দেবার যন্ত্রণা মায়া? জীবন মায়া? জীবনের আনন্দ-দুঃখ কামনা-বাসনা সব মায়া?

আর্যাম্মা উত্তর দিতে পারেন না। এ যে তাঁর পুত্রের মুখে শুনেছিলেন। কত আর বয়স তখন? দশ? বারো? ঠিকঠাক মনে পড়ে না। সব চেপে আসা মেঘের মতো হাল্কা কুয়াশার মতো অতীত দিনগুলো দুলতে থাকে। সরল জ্ঞানী স্নেহশীল স্বামী তখন গত। শঙ্কর তখন তিন বছরের শিশু। পুত্রকে মুখাগ্নি দিতে নিয়ে গেল মাধবীর স্বামী নাগভূষণ। সঙ্গে নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের একজন মানুষ।

কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল শুকিয়ে গেছে তাঁর। মাধবীর মতো তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ তাঁর ধাতে নেই। তিনি জানেন দেবতা আছেন। তাদের কাছে প্রার্থনা 'ভজনম্'-এর ফল আছে। তিনি মাধবীর মতো কটু ভাবে জীবনটাকে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। স্বপ্নের মতো দৃশ্য তার মনের আকাশে ধরা দেয়। মাঝে মাঝেই মনে পড়ে 'বৃষাচলমের' সেই আশ্চর্য সন্ধ্যার কথা। তিনিও দণ্ডায়মান জটাজুটধারী— মাথায় দ্বিতীয়ার চাঁদ ঝকঝক করছে। তাঁর দক্ষিণ হস্তে বরাভয়। অন্যহাতে শূল। পরনে ব্যাঘ্রচর্ম। সে এক আশ্চর্য সন্ধ্যা! চোখ বুজলেই আজও ভিতর থেকে জেগে ওঠে সেই তিনটি দৃপ্ত দীপ্তিমান দৃষ্টি। আর সেই আশ্চর্য রূপ।

২

পদ্মপদ তাঁর নাম। হঠাৎ একদিন একটা ছোট্ট ডিঙিতে চূর্ণা নদীর ওপার থেকে এসে ঘাটে নামলেন। তরুণ সন্ন্যাসী। ঠিক যেন তার হারিয়ে যাওয়া